শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

(আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত

“জিহাদ থেকে প্রাপ্ত সুফলসমূহ” রিসালাহ এর

অংশবিশেষ

দ্বীনের স্বার্থে কি ধরনের কাজ করা উচিত? নিছক হালাল নাকি সর্বোত্তম হালাল? নিছক শরীয়তসম্মত নাকি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত?

পরিবেশনায়:

বালাকোট মিডিয়া

শাইখ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) রচিত "জিহাদ থেকে প্রাপ্ত সুফলসমূহ" রিসালাহ এর অংশবিশেষ

দ্বীনের স্বার্থে কি ধরনের কাজ করা উচিত? নিছক হালাল নাকি সর্বোত্তম হালাল? নিছক শরীয়তসম্মত নাকি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত?

লেখক: আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

নিঃসন্দেহে, এই কোরআন পথ দেখায় সেই দিকে, যা সর্বাধিক সরল এবং সঠিক...[১]

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৯

কারাগারে এক সাথী একবার আমাকে বললো যে, বেসামরিক এক আমেরিকান ব্যক্তিকে কিছু মুজাহিদীন হত্যা করে সেটি টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে প্রচার করে দিয়েছে, যাতে পুরো বিশ্ববাসী তা দেখতে পায়। কিন্তু এর ফলে নিজেদেরকে মানবাধিকারের রক্ষক বলে দাবি করে আসা আমেরিকানরা আবু গারিব কারাগারে কি নৃশংস পাশবিকতা করে আসছে, তার উপর থেকে সকলের দৃষ্টি সরে গিয়ে পড়ে মুজাহিদীন ভাইদের এই অপারেশনের ওপর! আর তখন সেটা "গরম খবর" এ পরিণত হয়। এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলো কারাগারের সেই সঙ্গীটি। আমি জবাব দিলাম যে, আমি কখনোই এমন কাজকে সমর্থন করি না। যদিও আমি জানি যে, মুজাহিদীনরা যখন এই কাজটি করেছিল তখন তাদের মনে কেমন ঝড় বয়ে চলছিল। দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইসলামের শক্তি ও গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রতি তাদের সযত্ন প্রচেষ্টা, উম্মাতের দুঃখ-কষ্টে তাদের আহত অন্তর থেকে ঝরে পড়া কান্না, এবং দুর্বল মুসলমানদের উপর শত্রুর বিষাক্ত মরণ থাবার প্রতি তাদের রাগ ও ক্ষোভ আমি উপলব্ধি করতে পারি। এসব কিছুর কারণে তারা এই খবরটি প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যা করেছে তা আমার পছন্দনীয় নয়, আর আমি মনে করি, তারা যদি এই কাজটি না করতো, আর যদি তারা তা প্রচার না করতো! (তাহলেই ভালো হতো!)

যে ব্যক্তি নিজেকে ইসলামী জিহাদী স্কুলের একজন শিক্ষার্থী মনে করে, তার দ্বারা এমন কাজ করা শোভা পায় না যার কারণে তাকে ভৎর্সনার শিকার হতে হবে। বরং তার তো এমন কাজে মনোনিবেশ করা উচিৎ যে কাজের মাধ্যমে জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হবে, এবং তার সে সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকা দরকার যার ফলে এই পতাকার রং মলিন বা বিবর্ণ হতে পারে কিংবা যে কাজের ফলে শত্রুরা এর সুযোগ নিয়ে মুজাহিদীনদের উপর অপবাদ আরোপ করে সেই কাজকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।

আমার সঙ্গী বিস্ময়ভরে বলে উঠলো, "আপনি আমাকে বড়ই বিস্মিত করলেন! কেন আপনি এসব কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করছেন! এগুলো কি ইসলামে হালাল নয়?"

আমি উত্তর দিলাম: হে আমার ভাই, আমি যখন বলি যে, আমি কোনো একটি বিষয় অপছন্দ করি, তখন এর জন্য সেই বিষয়টির শরীয়ত বিরোধী হওয়া অথবা বিবাদপূর্ণ হওয়া জরুরি নয়![২] মুসলমানদের মাঝে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে, তার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে কিছুই হতে পারে না। কিন্তু জিহাদের ক্ষতি করবে কিংবা এর মর্যাদা হানি করবে এমন সবকিছু রুখে দিতে আমি বদ্ধপরিকর। বিশেষ করে এটি এমন একটি সময় যখন যুদ্ধ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং মিডিয়াও এখন এ যুদ্ধে এক বিশাল ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত এবং জিহাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী এবং যথাযথ পদ্ধতি বেছে নিতেই আমি এই অবস্থান গ্রহণ করেছি।

আমার লেখনী, বক্তৃতা ও ক্লাসে আমি বার বার আপনাকে এবং সবাইকে একটি কথা বলেছি - দায়ীগণ এবং মুজাহিদীনগণ যেভাবে করে চাইছেন, সেভাবে করে কখনোই উম্মাহ ও জিহাদের বিজয় ও উপকার সাধন করা সম্ভব নয়, যতদিন না তারা হালাল-হারামের খাঁচা থেকে বের হয়ে আসেন; আর তার বদলে হালাল বিষয়গুলোর মাঝে কোনটি সর্বাপেক্ষা বেশী উপকারী, কোনটি হালাল হওয়া সত্ত্বেও কৌশলগত দিক থেকে ক্ষতিকর, কোনটি সুবিধাজনক, কোনটি বেশী জোরালো, আর কোনটি সবচাইতে সঠিক, সে হিসেব করা শুরু না করেন।

---

[২] অর্থাৎ, একটি জিনিস কেবলমাত্র শরীয়ত বিরোধী হলেই সেটিকে অপছন্দ করতে হবে, আর সেটি শরীয়তে হালাল হলে সেটিকে অপছন্দ করা তো যাবেই না, বরং সেটি করতে হবে - বিষয়টি এমন নয়! একটি বিষয় ফরয হওয়া ও হালাল হওয়ার মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নামাজ সকলেরই পড়তে হবে, কারণ তা পড়া ফরয ও বাধ্যতামূলক, কোনো মুসলমানের এই কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি নামাজ পড়বো না, কারণ আমি তা অপছন্দ করি। কিন্তু, মরুভূমির এক বিশেষ প্রজাতির সরীসৃপ খাওয়া হালাল হওয়া সত্ত্বেও কোনো মুসলমান এরূপ বলতে পারেন যে, আমি সেটা খাবো না, কারণ আমি তা অপছন্দ করি। কারণ সেই বিশেষ প্রজাতির সরীসৃপ খাওয়া হালাল মানেই এই নয় যে, তা খাওয়া আবশ্যক এবং তা অপছন্দ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

নিঃসন্দেহে, এই কোরআন পথ দেখায় সেই দিকে, যা সর্বাধিক সরল এবং সঠিক...[৩]

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم

আর তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো... [৪]

অতএব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবচাইতে কল্যাণকর, উপকারী আর উত্তম কাজের অনুসরণ করারই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ

যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে...[৫]

মুসলমান হিসেবে আমাদের তো কেবল কোনটি হালাল, আইনসিদ্ধ আর অনুমোদিত সেটি দেখলেই চলবে না; এগুলো সর্বজন স্বীকৃত, সকলেরই জানা। আর যে সব বিষয় হালাল সেগুলোর দ্বারাই আমাদেরকে দ্বীনের বিজয় আনতে হবে। আল্লাহর হাতে যা (দ্বীনের বিজয়) আছে তা আমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কখনোই পাবো না, আর আল্লাহর দ্বীন কোনোদিনও হারাম, কুফর বা শিরকের সাহায্যে বিজয়ী হবে না। দ্বীনের জন্য যারাই কাজ করতে চাইবে তাদের এই মৌলিক

---

[৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৯

[৪] সূরা যুমার, আয়াত: ৫৫

[৫] সূরা যুমার, আয়াত: ১৮

জ্ঞানটি থাকা চাই। দ্বীনের সাহায্যকারী ও মুজাহিদীনদের কাজের মূলনীতিই হলো হালালের মধ্যে থাকা ও হারাম পরিহার করা। সুতরাং কেবলমাত্র হালাল-হারামের ভিত্তিতে আমাদের প্রশ্ন তোলা উচিৎ নয়, বরঞ্চ যেমনটা আগেও বহুবার বলেছি, আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে, অনুমোদিত একাধিক হালাল পন্থার মাঝে কোনটি জিহাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী, মুসলমানদের জন্য সবচাইতে বেশী কল্যাণকর, এবং শত্রুর সবচেয়ে বেশী ক্ষতিসাধনকারী।

যখন আমরা খাদ্য, পানীয়, জামা-কাপড় বা বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করি, তখন কিন্তু আমরা শুধু অনুমোদিত, শরীয়তসম্মত, আর হালাল - এতটুকু নিয়ে মোটেও খুশি থাকতে পারি না; বরং আমরা সবচেয়ে ভালো খাবার, পানীয়, পোশাক-আশাক, আর সবচেয়ে উত্তম নারীটিকেই নিজেদের জন্য বেছে নেই। কিন্তু যেই না দাওয়াত, জিহাদ বা দ্বীনের ক্ষেত্রে কথা ওঠে, তখন যেন সবকিছুই গ্রহণযোগ্য আর পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায়; আর তা যদি হয় অনুমোদিত, ইসলামী শরীয়তসম্মত আর হালাল, তাহলে তো কথাই নেই, আরো চমৎকার ব্যাপার!

আচ্ছা, একটি উদাহরণ দেই, যে নারীটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এক চোখে অন্ধ, আর পঙ্গু তাকে বিয়ে করা কি শরীয়তসম্মত নয়? নিঃসন্দেহে, এটি হালাল এবং শরীয়তসম্মত, তার উপর এমন নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে আপনি পুরস্কৃতও হবেন! তাহলে কেন আপনার অভিলাষ আর প্রাণপণ চেষ্টা থাকে এমন এক নারীকে বেছে নেয়ার যে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবতী, শুধু তাই নয়, বরং তাকে হতে হবে সুন্দরী?

আমি একটি সত্য কাহিনী বলি, এ ঘটনাটি শুনে হয়তো এ বিষয়টির রুক্ষতা কিছুটা দূর হবে। আমাদের এক বসনিয়ান ভাই আমাকে জানালেন যে, কিছু আরবীয় তরুণ এক মুজাহিদ ভাইকে একটি ব্যাপারে খুব পীড়াপীড়ি করছে। তাদের সাথে যেন বসনিয়ার এতিম নারীদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এই ছিল তাদের চাওয়া (উল্লেখ্য, বসনিয়ার নারীদের গায়ের রং ফর্সা হয়)। তাদের ভাষ্য, এতে করে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বসনিয়াতে কি পরিমাণ জুলুম-নির্যাতন, হত্যা আর ধর্ষণ চলছে সে কথাও বললো তারা। তারা তাদের অন্তরের গভীরের মমতা আর আগ্রহ ব্যক্ত করে তাদের অনুরোধ রাখার জন্য চাপাচাপি করতে থাকলো। সেই মুজাহিদ ভাই তাদেরকে কথা

দিলেন যে, কয়েকদিন পরে তিনি তাদের প্রস্তাবের জবাব দেবেন। কিন্তু তাদের চাপাচাপি আর থামে না, তো তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি তোমাদের প্রস্তাব নিয়ে ভেবেছি, এবং তোমাদের মাঝে উম্মাতের কথা বিবেচনা, এবং নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা করার যে মানসিকতা আছে তা আমি যারপরনাই শ্রদ্ধা করি। আমি আফ্রিকার উপমহাদেশের বহু দরিদ্র ও এতিম বোনদের কথা জানি, যেমন: ইথিওপিয়া আর সোমালিয়ার বোনেরা (এসব অঞ্চলের মানুষের গায়ের রং কালো)। আমি সর্বতো চেষ্টা করবো এই বোনগুলির সাথে তোমাদের বিয়ে করিয়ে দিতে যাতে করে তোমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারো, যেমনটি তোমরা চাও!” এর কিছুক্ষণ আগেই এই তরুণেরা কথা দিয়েছিল যে, তারা তাকে কিছুদিন পরে নিজেদের উত্তর জানাবে। কিন্তু সেই যে তারা গেলো, এই ভাই আর কোনোদিনও তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনলেন না!

তো কেন তারা প্রস্থান করলো আর কোনোদিন ফিরে আসলো না? তিনি কি তাদেরকে একটি শরীয়তসম্মত, হালাল, উপরন্তু সওয়াব মিলবে এমন একটি প্রস্তাব দেন নি? এটি কি এ কারণে নয় যে, এ বিষয়গুলোতে আমরা নিজেদেরকে কেবল হালাল ও শরীয়তসম্মত জিনিসের মাঝেই সীমিত রাখি না, বরং যেটি আরো বেশী ভালো, সুন্দর ও মনোরম আমরা সেটি খুঁজি?

হে আমার ভাই! যখন আমরা খাদ্য, জামা-কাপড় আর বিয়ে নিয়ে ভাবছি, তখন আমরা সবচাইতে বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট মানের বস্তুগুলিই কেবল গ্রহণ করতে চাই, তাহলে দ্বীন, জিহাদ আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিচুমানের কোনোকিছু গ্রহণ করা কিভাবে বোধগম্য হতে পারে? আল্লাহ তাআলা উম্মে নিদাল আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ কে রক্ষা করুন! তিনি ইহুদীদের দখলদারিত্ব চলাকালীন সময়ে তার ছেলে মাহমুদকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেছিলেন। সে বুলেট বর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণ করে ইহুদীদের আস্তানায় ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়, শিকারের উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে সেখানে সাত ঘণ্টার জন্য লুকিয়ে থাকে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে লড়াই করতে থাকে আর হত্যাকাণ্ড চালায়। ছেলে মারা যাবার পর মাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার একটি কথা ছিল এমন: “আমি ওকে ইহুদীদের দিকে পাথর খণ্ড ছুড়তে দেই নি, যেন তারা ওকে গুলি করে মেরে না ফেলে, যাতে ও আহত হয়ে না যায়, কেননা তেমনটা হলে ওর কাঁধে যে গুরুদায়িত্ব ছিল সেটা

ও কখনোই করতে পারতো না।” তিনি ছেলেকে বলতেন, “আমি চাই তুমি পাথর ছুড়ে মারার চেয়েও বড় কোনো কাজ করো।” আর তিনি বলেন, “আমার ছয় ছেলে আছে, যাদেরকে আমি আল্লাহর রাহে কোরবানি করতে প্রস্তুত করছি, তবে তা হতে হবে মাহমুদের মতো সম্মানজনক উদ্দেশ্যে...”

কবে আমাদের মুজাহিদীন তরুণরা পরিপক্কতা লাভ করবে এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে এভাবে রূপ দিবে? কিংবা আরো মহান কিছু করার পরিকল্পনা করবে? আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের শ্রম, সম্পদ আর আত্মত্যাগের তিন-চতুর্থাংশই আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে - হয় তাদের অদূরদর্শিতার ফলে কিংবা তাদের নেতাদের অদূরদর্শিতার ফলে - যার কারণে দেখতে পাই যে, নিছক হালাল হবার অজুহাতে নিচুমানের কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে!

কবে আমরা কোনটি সবচাইতে উত্তম, কোনটি উম্মাতের জন্য সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর আর কোনটি শত্রুর জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতির কারণ, তার ভিত্তিতে আমাদের প্রচেষ্টা ও জিহাদকে পরিচালিত করবো?

কবে আমরা কেবল হালাল ও শরীয়তসম্মত হবার সীমা ছাপিয়ে আরো গভীরে দেখার চেষ্টা করবো? আর তাদের ভেতর থেকে সবচাইতে মহান, সম্মানজনক ও নিখাদ কাজটি বেছে নেবো, যা জিহাদের পতাকাকে সমুচ্চ করবে?

আমার এ কারাসঙ্গীটি কিছু সিনেমা হল আর মদের দোকান বিস্ফোরণের কারণে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময় কারাবন্দী থেকে এবং কারাজীবনে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার পরেও এখন পর্যন্ত তার চিন্তাধারা পরিপক্কতা লাভ করে নি, সে আগের মতোই রয়ে গেছে। আমি আমার সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার যদি আমার কথা পছন্দ না হয়, আমার কথা যদি মানতে না চাও, তাহলে এক কাজ করো: কাল জেল থেকে ছাড়া পেলে, বের হয়ে আবারো সিনেমা হল আর মদের দোকান উড়িয়ে দিও। ঠিক আছে, তুমি এটাই করো। যেখানে আজকের মুসলমানেরা আরো বড় কিছু পেতে আগ্রহী, তারা বিশ্বের সবচেয়ে দাম্ভিক

পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে, তাদের চাওয়া হলো একটি ইসলামী রাষ্ট্র, তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব পরিচালনায় মুসলমানদের অবস্থান সুসংহত করতে এবং দুনিয়ার বুক থেকে কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। যখন তারা প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি আর মুজাহিদীনদের কাছ থেকে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা, শরীরের সবখানি রক্ত ঢেলে দেয়ার আশা করে, তখন তুমি এটাই করো। তুমি এই উচু মানের গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য কোনোকিছুতে অংশগ্রহণ না করে গুনাহগার মুসলমানগণ আর সাধারণ জনতার বিরুদ্ধে তোমার লড়াই অব্যাহত রাখো, সিনেমা হল উড়িয়ে দাও যেখানে জনসাধারণের নিয়মিত যাতায়াত। তোমার এই কাজ তো হালাল, শরীয়তসম্মত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাই না...?! সে বললো, "না, আমি এ কাজ আর কখনো করবো না, কারণ এখন আমি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি, আমিও মহৎ কিছুর আশা করি..."

আমি জবাব দিলাম: আমি তোমাকে যা বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে অপারগ হও, তাহলে তোমার জ্ঞান ও বুঝের আরো পরিপক্কতা দরকার। তুমি এখনো এ বিশ্বের চ্যালেঞ্জ, বাস্তবতা এবং উম্মাহ ও দ্বীনের কি প্রয়োজন তা বুঝতে পারো নি।

টেলিভিশন স্ক্রীনের সামনে কিছু আমেরিকান, যাদেরকে বর্তমান বিশ্বের ভাষায় "বেসামরিক" বলা হয়ে থাকে, তাদেরকে হত্যা করা হলো, তারপর ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয়া হলো, যে কাজকে কিছু আলেম এক প্রকারের অঙ্গবিকৃতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখো, এ কাজটি টিভিতে প্রচার করার পর কি পরিমাণ শোরগোলটাই না বেঁধে গেলো?

আল্লাহর শত্রুরা, ভণ্ড আলেমের দল, আমেরিকা আর অত্যাচারী জালেমরা এই ঘটনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জিহাদের উপর অপবাদ প্রচারণা শুরু করেছে, মুজাহিদীনদের উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মুজাহিদীন ও তাদের নেতিবাচক কাজের প্রতি সাধারণ মুসলমানদেরকে, এবং বিশেষ করে ইরাকী মুসলমানদের মনকে একেবারে বিষিয়ে তুলেছে। এ কাজের দিকে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং টিভিতে ফলাও করে সম্প্রচার করা নিশ্চিতভাবে কোনো উপকার বয়ে আনে নি। আমার বিশ্বাস, যারাই এ কাজটি করেছে, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় নি। যদি কেউ আজকে আল্লাহর শত্রুর মাথা উড়িয়ে দিতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই আজকের বিশ্বে চলমান যুদ্ধের

গতিপ্রকৃতি, মাধ্যম ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, আজকের যুদ্ধ কেবল একটি ছুরির ওপর ভর করে চলছে না, যা দিয়ে সে সেই আমেরিকানের মাথা কেটে ফেলেছিল। জিহাদ বোঝার সামর্থ্য ছুরির আকার ও মাপের ওপর নির্ভর করে না, বরং জিহাদ নির্ভর করে জিহাদের মাধ্যম, মিডিয়া, জনমত, মানুষের সমর্থন এবং সঠিক ধাপ বেছে নেয়ার পরিপক্কতার উপর। কিছু সময় আছে যখন অন্যদের কথা ভেবে কিছু কাজ পরিহার করতে হবে, কখনো বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ কাজ করার ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে, কখনো আবার নিজেদের কাজ সর্বসমক্ষে প্রচার করতে হবে যদি দেখা যায় এ কাজের পরিষ্কার কার্যকারিতা আছে, এবং এর থেকে কোনো বিবাদ বা বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি তারা এমনটি করতে পারে, তাহলে তাদের নিজেদের মিডিয়া, এমনকি শত্রুর মিডিয়াও তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হবে, কেননা তারা তখন মিডিয়াকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারবে যেভাবে তারা চায়। শত্রুরা তখন আর তাদের ইচ্ছামত মিডিয়া পরিচালনা করতে পারবে না, কারণ তারা মুজাহিদীনদের কোনো ভুলের সুযোগ নিয়ে নিজেদের নোংরা স্বার্থ হাসিল করবে - এমন কোনো সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, তবে শুধু ইসলামী জ্ঞানের সাহায্যে কেউ এসব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এই বিষয়গুলো সফলভাবে সম্পাদন করতে হলে বাস্তবতা বুঝতে হবে, শত্রু ও তাদের ষড়যন্ত্রকে বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উম্মাতের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, কোনটি এখন সবচাইতে বড় সমস্যা, আর কি এখন উম্মাতের জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার।

তুমি যদি আমাকে বলো, "হে শাইখ, আপনি তো আমাদের আশার উপর পর্দা ফেলে দিলেন, বৃহৎ পরিসরকে সঙ্কুচিত করে দিলেন! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দীদেরকে হত্যা করেছেন, বনু কুরায়যার অধিকাংশ জনগণকে মেরে ফেলেছেন, আর তাঁর কাজই আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ!" আমি তাহলে জবাব দেব, হ্যাঁ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তোমরা যদি এ আদর্শকে একটু বুঝতে, নিরীক্ষণ করতে, গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে, তাহলে তোমরা মহাসাফল্য অর্জন করতে।

এ কারণেই যে সব উলামা এই মহান আদর্শ নিয়ে ভালোভাবে গবেষণা করেছেন, তারা বলেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তা ইমামের ইচ্ছা, তিনি চাইলে দয়াপরবশ হয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারেন, তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে পারেন, মুসলমান কারাবন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন, হত্যা করতে পারেন কিংবা তাদের ধর্ম, ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা কতখানি সেই ভিত্তিতে যা ভালো মনে হয় সেটাই করতে পারেন।

এই উলামাদের মতে, তার প্রতি গৃহীত ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে "ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনটি সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর ও উত্তম" সে কথা বিবেচনা করে। উলামাগণ আমাদেরকে এ ব্যাপারেই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত ও কার্যকর তা করতে হবে, আর আমিও এ কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। মুজাহিদীনদেরকে আমরা জিহাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পথ গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছি!

তুমি যদি যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন নিরীক্ষণ করে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবার ক্ষেত্রে এক নীতি গ্রহণ করেন নি, কখনো তিনি তাদের উপর দয়া দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, যেমনটি হয়েছে সুমামা বিন ইসালের ক্ষেত্রে, কখনো তিনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, কখনো বা শিক্ষামূলক নজির স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাদের মেরে ফেলেছেন। প্রতিশোধ বা অন্য কোনো কারণেও তিনি যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করেছেন, যেমনটা করা হয়েছে উরাইনাহ গোত্রের লোকদের সাথে যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তারা রাখালদের হত্যা করে তাদের চোখ উপড়ে ফেলতো, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাদের উপর একইভাবে প্রতিশোধ নেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকা এক কাফেরকে হত্যার নির্দেশ দেন, আর তার মৃত্যুর খবর মক্কার নেতাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, কিংবা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু এসব উদাহরণের কোথাও এমন দেখা যায় না যে, তিনি যুদ্ধবন্দীদের সকলকে শুধুমাত্র হত্যাই করছেন। বরং যারা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে শত্রুতায় সবচাইতে কঠোর ছিল তাদের প্রতিই সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা হেকমতের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল।

আবদুল উযযা, বা আব্দুল্লাহ ইবনে খতাল, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার দেয়াল ধরে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় হত্যা করেন, তারা ছিল এমন এক গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিনেই যাদের রক্ত হালাল বলে ঘোষণা দেন। অন্য সকল কাফেরদের মধ্যে তাদের ব্যাপারেই কেবল এই ঘোষণা দেয়ার কারণ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র শত্রুতা, প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং চরম বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ। আব্দুল্লাহ ইবনে খতাল ইসলাম গ্রহণ করার পর, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একজন আনসারের সাথে একটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, লোকটি আনসার ব্যক্তিটিকে হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে যায়। এই আবদুল্লাহ ইবনে খতাল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে বিদ্রূপমূলক কথাবার্তা বলতো, মুশরিকদের সামনে তার দু'জন বাদী গায়িকাকে দিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক গান শোনাতো। তাই বন্দীত্বের সময় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার একজন গায়িকা সহ তাকে হত্যা করেন। এরূপ আরেকটি উদাহরণ হলো, মুকাইস বিন সাবাবাহ নামের এক লোককে হত্যা করা হয়, যে ইসলাম গ্রহণের পরে মুরতাদ হয়ে যায়, মুসলমানদের হত্যা করে, মুশরিকদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে মিথ্যা অপবাদ রটাতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উগ্রভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

সুতরাং, সেই অপরাধগুলোর কথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো যেগুলোর জন্য তিনি বন্দীদেরকে মেরে ফেলেছিলেন, আর তার সাথে তুলনা করো মক্কার জনপদের, যাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করেছিলেন। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল সে লোকগুলো ইসলাম ত্যাগ, খুন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ, শত্রুতা এবং অপবাদ রটানোর মতো মারাত্মক সব অপরাধ করেছিল। যেহেতু মক্কা বিজয়ের পর সকল মুশরিক বন্দীদের মধ্য থেকে কেবল এই

লোকগুলোকেই হত্যা করা হয়েছিল, তাই শাইখুল ইসলাম এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবমাননা করা হলে তাকে হত্যা করা ফরয।

কিন্তু তারপরও, যদি এমন অপরাধী কোনো ব্যক্তি তার গোত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। হাব্বার বিন আল-আসওয়াদের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছিল; সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে হিজরতের সময় আক্রমণ করেছিল, সে যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর উটে আঘাত করতে থাকে, ফলে তিনি একটি পাথরের উপর পড়ে যান। সে সময় তিনি ছিলেন গর্ভবতী, তার গর্ভপাত ঘটে। এছাড়া আরো উদাহরণ আছে। যেমন: ইকরিমাহ বিন আবু জাহল ও কায়নাহ বিন খাতালসহ আরো অনেককে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

শুধুমাত্র যে দু'জন যোদ্ধা সৈনিককে বন্দীত্বের সময় হত্যা করা হয় তাদের নাম যথাক্রমে আল-নাদর বিন আল-হারিস, যে কথায় ও কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অপমান ও তাঁর ক্ষতি করতো, এবং উকবা বিন আবু মুঈত, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীদের মারাত্মক ক্ষতি ও নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয় নি, উপরন্তু কোরআন ও নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে মিথ্যাচার, তাঁর ক্ষতি করা, তাঁকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা, সিজদারত অবস্থায় তাঁর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেয়া - এসব জঘন্য কাজ করেছে। তাই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব বন্দীর মধ্য থেকে কেবল এ দু'জনকে হত্যা করেন।

বনু কুরাইযার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যুম (রহিমাহুল্লাহ) এর আল-যাদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইহুদীদের মাঝে আল্লাহর সাথে কুফরী ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় সবচেয়ে প্রবল ছিল তারা। আর এজন্যই তাদের সাথে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা অন্য কোনো ইহুদী গোত্রের সাথে করা হয় নি, যেমন বনু কায়নুকা ও নাযির গোত্র।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তারা (বনু কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের কাফেরদেরকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধিতায় সহায়তা করেছে, আর তাদেরকে গাতাফান গোত্রের সাথে মিলে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করেছেন, এর আগে নয়। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হবার পেছনে একটি কারণ ছিল এই গোত্রের ইহুদীরা। সুতরাং, সব ইহুদী গোত্রের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনু কুরায়যার সাথে আলাদাভাবে বোঝাপড়া করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটাই করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গভীর প্রজ্ঞা এবং সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কথা বিবেচনা করে তিনি নিজে থেকে তাদেরকে হত্যা করার বিধান দেন নি, কেননা আনসারদের মাঝে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীরা এতে করে খারাপ ধারণা করতে পারেন। বরং তিনি আউস গোত্রে তাদের যে মিত্রেরা ছিল, এমনকি স্বয়ং বনু কুরাইযা গোত্রের ইহুদীদেরকেই এ রায় দিতে বললেন। আর ইহুদীরা তো সাদ বিন মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘোষিত যেকোনো রায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, তাই তিনিই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ রায় দিলেন যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করতে হবে। নিরীক্ষণ করে আমরা দেখি যে, এমন একটি বর্ণনাও নেই যেখানে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৈনিক যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্দীত্বের সময় হত্যা করেছেন বা সাম্প্রতিক ভাষায় যাদের “বেসামরিক” ব্যক্তি বলা হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন। সত্যি বলতে, যোদ্ধাদের মাঝেও তিনি কেবল তাদেরকে হত্যা করেছেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুফর, শত্রুতা, যুদ্ধ, অবমাননা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ছিল সবচাইতে প্রখর। নিঃসন্দেহে, এভাবে একজন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ রায় দেয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। শুধুমাত্র হালাল ও অনুমোদিত বিষয়ের সীমা ছাপিয়ে কোনটি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম এবং কিভাবে আল্লাহর শত্রুদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করা যায় তা এখানে বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম ও তাঁর সাথে সবচাইতে শত্রুতা পোষণকারী প্রত্যেক শত্রুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন; যারা

আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেন যেন তারা চুক্তি মানার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থাকে, এবং চুক্তির সীমালঙ্ঘন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও শত্রুতা শুরু না করার ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করলেন। এছাড়াও এর আরো অনেক কার্যকারিতা ছিল। মধ্যস্থতাকারী সাদ বিন মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক্ষেত্রে সবচেয়ে হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে সবচাইতে তীব্র ও ক্ষতিকর পন্থাটিই বেছে নিয়েছেন, এবং তাদের সাথে অন্যান্য কাফের, এমনকি যোদ্ধাদেরকেও একই কাতারে ফেলেন নি। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো মৃতদেহকে বিকৃত করেন নি, বরং তা করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চোখের সামনে যে লোক তাঁর চাচা হামজা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অঙ্গবিকৃত করছে, সেই মুশরিক লোকের দেহ বিকৃত করা থেকে পর্যন্ত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেকে বিরত রাখলেন। যদিও অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা অনুমোদিত, শরীয়তসম্মত, তা সত্ত্বেও তিনি উম্মাহকে শিখিয়েছেন যে, জিহাদ এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী, উত্তম ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি বেছে নিতে হবে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁকে করতে বলেছেন,

وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল...[৬]

আল্লাহ তাআলা এরপর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো উত্তম বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন,

وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ۝١٢٦

...কিন্তু যদি তুমি সবর করো, তবে তা সবরকারীদের জন্য আরো উত্তম।[৭]

---

[৬] সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬

[৭] সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেন,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ

আর মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দ...[৮]

তারপর তিনি বলেন,

فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ

...কিন্তু যে কেউ ক্ষমা করে আর সদ্ভাব সৃষ্টি করে, তাহলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার...[৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ

...জখম সমূহের বিনিময়ে সমান জখম...[১০]

আর তারপর তিনি বলেন,

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

...কিন্তু যে (প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, দান হিসেবে) ক্ষমা করে দেয়, সেটি তার জন্য হবে প্রায়শ্চিত্য (অর্থাৎ এর দ্বারা তার নিজের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে)...[১১]

---

[৮] সূরা শূরা, আয়াত: ৪০

[৯] সূরা শূরা, আয়াত: ৪০

[১০] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫

[১১] সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৫

মুজাহিদীনগণ ও জিহাদের পথে আহবানকারী দায়ীদেরকে এ জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি সর্বদা তৎপর হয়ে থাকি; যাতে করে তারা নিজেদের আশা-ভরসা, সংকল্প, প্রচেষ্টা, উদ্যম এবং চিন্তাধারায় এ ব্যাপারগুলোর স্থান দেয়। ইসলামী জিহাদের সুমহান মর্যাদা তাদের মনে রাখতে হবে, উম্মাহ ও দ্বীনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় কোনটি তা বিবেচনা করতে হবে, নিজেদের কাজকে কেবল হালাল ও শরীয়তসম্মত - এটুকুর মাঝে বেঁধে রাখলে চলবে না। বরং তাদেরকে বেছে নিতে হবে মুক্তোর মতো নির্মল কাজগুলোকে, যা উম্মাহ ও জিহাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, কার্যকরী এবং জোরালো। তারা যেন কেবলমাত্র ভাসা-ভাসা ভাবে কোনটি হালাল, শরীয়তসম্মত ও অনুমোদিত সেই বিচারে কাজ না করে, বরং তারা প্রত্যেকটি ব্যাপার খতিয়ে দেখবে, মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করবে, গবেষণা করবে, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে, কোন কাজটি করা একটি বিশেষ সময়ের জন্য সবচাইতে উপকারী, উৎকৃষ্ট, এবং শত্রুর প্রতি সর্বাধিক ক্ষতিকারক।

আমি শুধু এটুকু বলেই শেষ করবো না, বরং আমি আরো বলবো যে, এভাবে সর্বাধিক উপযোগী কাজটি বেছে নেয়া ফরয, যেহেতু মুসলমানদের আজ অসংখ্য দায়িত্ব পূরণ করতে হবে। আর ফরয কাজের মধ্যে অনেক কিছুই পরস্পর বিরোধী।[১২] সুতরাং হতে পারে, খুব বিশাল পরিসরের কিন্তু কম উপযোগী একটি ফরযের বদলে তাদেরকে এমন একটি ফরয কাজের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে যার সুযোগ খুবই সীমিত কিন্তু অধিক উপকারী।[১৩] আমাদের এই জিহাদে আমরা তরুণদেরকে যেকোনো ভাবে, যেকোনো প্রকারে, কিংবা যার-তার নেতৃত্বে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরয - এমনটা বলতে পারি না। বরং তাদের ওপর ফরয হলো জিহাদের ময়দানে শত্রুর

---

[১২] অর্থাৎ, জিহাদ ফরয। এর ভিত্তিতে শত্রুদের ক্ষতি সাধন ফরয, কিন্তু ক্ষতি সাধনের ধরন বা প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এক ধরনের ক্ষতি সাধন আরো বড় ধরনের সুফল আনয়নকারী ক্ষতি সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

[১৩] উদাহরণস্বরূপ, রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় অনেক হারাম পোস্টার আছে যেগুলো দলবদ্ধ ভাবে রাস্তায় নেমে ছিড়ে ফেলা যায়, এ কাজ করার জায়গা ও সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু এর চাইতে অনেক কম সুযোগ মিলে সেই কাফের-মুর্তাদ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য, যে কাফের-মুর্তাদ ব্যক্তি সুপরিকল্পিতভাবে এদেশে কুফরী মতবাদ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মোকাবেলা করা, উম্মাতের ওপর আপতিত বিপর্যয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ এবং মুসলমানদের জান-মাল বৈধ ঘোষণাকারী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এই কঠিন বাস্তবতার সাগরে, যখন ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের প্রশ্ন আসে, তখন সে কাজই বেছে নেয়া কর্তব্য যা উত্তম, গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিকতর শ্রেয়। তাদের বেছে নিতে হবে কলঙ্কবিহীন নির্মল জিহাদের ঝাণ্ডা, খুঁজে নিতে হবে সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতৃত্ব। সরকারপুষ্ট আলেমদের বক্তৃতা, মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণা কিংবা অন্তঃসারহীন আবেগ দ্বারা যেন এ মনোনয়ন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়ে না যায়। বরং, যেমনটি আমি বার বার বলে চলেছি, এই বাছাই করার ভিত্তি হবে, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উপকারী, জিহাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিষ্কলঙ্ক, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজটি বেছে নেয়া।

মুজাহিদীনদের উচিৎ আক্রমণাত্মক জিহাদের উপর আত্মরক্ষামূলক জিহাদ পরিচালনায় অগ্রাধিকার দেয়া, কেননা আক্রমণাত্মক জিহাদ একটি দলগত দায়িত্ব (ফরযে কিফায়া), কিন্তু আত্মরক্ষামূলক জিহাদ একটি ব্যক্তিগত ফরয (ফরযে আইন)। তাই, উলামাগণ আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে অনুমতি নেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন, যেমন মা-বাবা বা ঋণদাতার নিকট থেকে অনুমতি নেয়া, তবে আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ব্যাপারে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তাদের জানা উচিৎ যে, মুসলমানদের ভূমিকে আভ্যন্তরীণ হোক কিংবা বাহ্যিক, যেকোনো কাফের বা জালেম শাসকের হাত থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করা আত্মরক্ষামূলক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, এভাবে জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ও দ্বীনকে শক্তিশালী করে তোলা তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এ ধরনের জিহাদ সেসব সাধারণ হানাহানির চাইতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, যেগুলোর দ্বারা কেবল শত্রুকে নিছক আহত করা ছাড়া আর কোনো উপকার সাধিত হয় না, কিংবা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ সাধিত হয়।

তাদেরকে মুসলমান কারাবন্দীদের মুক্তির জন্য জিহাদ করায় প্রাধান্য দিতে হবে, কেননা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বলতে এমনটিই বোঝানো হয়, এবং তাদের উচিৎ দুর্বল ও মজলুমদের উদ্ধার করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করা, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর থেকে বহির্গত করুন! আর স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের জন্য রক্ষাকারী-বন্ধু নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।"[১৪]

সহীহ্ বুখারীতে আবু মূসা আল-আশআরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দাস মুক্ত করো..."

এ কারণেই ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যদি শত্রুরা এক বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক মুসলমানকে বন্দী করে, তবে অধিক শক্তিশালী মত হচ্ছে, ধরে নিতে হবে যেন শত্রুরা মুসলমানদের ভূমিতে প্রবেশ করেছে, আর তাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক জিহাদ), কেননা একজন মুসলমানের পবিত্রতা, মুসলমানদের ভূমির পবিত্রতার চাইতে অনেক বেশী, সুতরাং কারাবন্দীদের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করা ফরয।"

কোনটির উপর কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া উচিৎ সেটা বোঝা, কঠিন বাস্তবতায় ধৈর্যধারণ, শত্রুদের অনিষ্টের পরিমাণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের শত্রুতা ও যুদ্ধের তীব্রতার কথা মাথায় রাখলে একজন মুজাহিদের পক্ষে বিভিন্ন ফরয কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সহজ হবে। যার প্রকৃত ফলাফল হলো, সে দলবদ্ধ দায়িত্বের (যেগুলো ফরযে কেফায়া) চাইতে ব্যক্তিগত ফরযের (অর্থাৎ ফরযে আইন) ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিবে, আর সে বুঝতে পারবে কোথায়, কখন নীরব থাকা, বা দেরি করা চলবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে বিলম্ব করার অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনা, তাদের রক্ত-মাংস শত্রুর জন্য হালাল হয়ে যাওয়া বা এমন ভয়ানক

---

[১৪] সূরা নিসা, আয়াত: ৭৫

কোনো পরিণতি। সুতরাং তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রাধিকার দিবে, আর কেবলমাত্র তার নিজের উপর কতখানি ফরয সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি মুসলমানদের ব্যাপারসমূহের মীমাংসা করে দেন, এবং তিনি যা ভালোবাসেন এবং যে কাজে সন্তুষ্ট হন, তার উপর মুসলমানদের দৃঢ়পদ হবার তাওফীক দান করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এ কাজ করতে সক্ষম, তিনি সত্য বলেন এবং তিনিই সরলপথে পরিচালিত করেন। একজন ভাই আমার লেখাগুলো পড়ে, তার মাথায় গেঁথে থাকা তথ্যের সাথে মিলিয়ে আমাকে বললো, "হে শাইখ, আপনার কলম চালনায় নরম হোন, এর উপর দয়া দেখান!" যার উত্তরে আমি বলবো, আমি এর উপর দয়া দেখাবো, এমনকি একে প্রসন্ন করে তুলবো, তবে তা করবো মুসলমানদের জিহাদের পক্ষে একে চালানোর মাধ্যমে, আর যা কিছুই জিহাদের সুনাম নষ্ট করতে চাইবে, তা নিয়ে মিথ্যাচার করবে কিংবা জিহাদকে ভুল পথে পরিচালিত করবে তা (তার পক্ষে) লেখা থেকে আমি একে (কলমকে) পবিত্র (মুক্ত) রাখবো।

জিহাদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, সে এর উপর বিশেষ অধিকার ফলাবে, যে পথে ইচ্ছা সে পথে জিহাদকে পরিচালিত করবে, এমনটি ভাবলে চলবে না। বরং এতে সকল মুসলমানের অংশ আছে; জিহাদের তত্ত্বাবধান করা এবং জিহাদ কায়েমের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমানদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনের জন্য তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে, বিশ্বস্ততার সাথে জিহাদের ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশ, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতে হবে, দোয়া করতে হবে। যাদেরকে জিহাদের আমীর, বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়, তাদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। তাদের কোনো প্রকার তোষামুদে বা মন ভোলানো কথা ব্যবহার করা উচিৎ নয়, কোনোরূপ বিপথগামিতা, বিকৃতি কিংবা ভুল কাজে সায় দেয়া উচিৎ নয়, এমনকি তাদের সবচেয়ে কাছের কেউও যদি তা বলে থাকে তবুও তা করা ঠিক হবে না। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে খুশি করার বদলে তাদেরকে অবশ্যই সে কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা দ্বীন, জিহাদ এবং মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর।

আমি তাকে এবং তার মতো সবাইকে এটাই বলি: এ লেখনীর কথাগুলোর উপর প্রতিফলন করো, এই শব্দমালা এক কষ্টের কথা ব্যক্ত করে, যার দ্বারা জিহাদের দিকে আহবানকারী দায়ী ও মুজাহিদীনদের প্রতি আমি আমার সবচাইতে আন্তরিক উপদেশ প্রদান করছি। আমার এ কথাগুলোকে তোমরা "শাইখ কি অমুক বুঝিয়েছেন নাকি তমুক বুঝিয়েছেন" - এই চিন্তার মাঝে সীমিত করে ফেলো না, কেননা তাহলে তোমরা এর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। বরং তোমরা যা চিন্তা করছো, তার চাইতে এই ব্যাপারটি আরো অনেক বিশাল এবং আরো মহান। আমি নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই না। কেননা তা আমাকে দায়ী ও মুজাহিদীনদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যাদেরকে আমরা সত্যের ধারক, বাহক ও সচেতন বলে বিবেচনা করি। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমরা অতিরিক্ত প্রশংসা করতে চাই না, ইনশাআল্লাহ। আমার এই উদ্বেগ ও বেদনাভরা বইয়ে আমি তা লিখেছি যা অস্ত্র ও অঢেল সম্পদ দিয়েও অর্জন করা সম্ভব নয়। কেবল আশা যেন তা সকলে বুঝতে পারে। জিহাদকে সর্বাধিক কল্যাণকর পথে পরিচালিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনার উদ্বেগ থেকে আমি এই কথাগুলো লিখেছি, যেন আমি জিহাদের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিপথগামিতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে পারি।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

...আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আর আল্লাহর সাহায্য বৈ আমার কার্যসাধন (সম্ভব) নয়। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন।[১৫]

---

[১৫] সূরা হূদ, আয়াত: ৮৮